

আকাশ যখন রক্তিমভা ধারণ করল, নতুন নতুন মেঘে বেষ্টনে বেলা অত্যন্ত কমে এল, ছোট ছোট অগণিত তারার স্তবক তখন ধীরে ধীরে ক্ষিণ ক'রে গেল। দুই দিকের নিবিড় বনপথের দিক থেকে স্ত্রীত ও ভয়ঙ্কর নীরব শব্দ ভেসে এল। প্রথম চাইলুম, দূর উন্মুক্তের পানেই কক্ষণ। আমাকে কনকচাপাটে শ্বেত রক্ত ও সাস্থিক ব্যাঘেলু মনের এক অদ্ভুত পরিবেশে এনে দিল। গিরিমাটির ব্রত কৌতুক খেলা শুরু, নৌকা ছেড়ে তীরভূমি গলাজ মরাল, হাতে শ্বেত রক্তে কালিমার ব্রত, তারই মধ্যে মাণিক ও অন্যান্য ডুবুরীর স্বাবরত। কুঠুরীর মধ্যে ঢুকি এটা-ওটা সরাতে লাগল এবং আমার দিকে চাইতে লাগল, তারপর হঠাৎ রামচাপাল দরজায় এসে দিকচক্ষুতে চারদিকে চেয়ে কেউ নেই দেখে আমার দিকে আরও এসে এলো নীচুপুড়ে বললে, ‘ঠাকুরামশাই, আপনি এখনই এখান থেকে পালান, না হলে আপনি ভয়ানক বিপদে পড়বেন—এরা ফাঁসুড়ে ডাকাত, রাতে আপনাকে মেরে ফেলবে’—বলেই চট ক'রে বাড়ির মধ্যে চলে গেল। শুনে তো আমি আর নেই! হাতের পুঁতি হাতেই রইল, সমস্ত শরীর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল—আর সারা হাত-পা অবশ ও বিশ্রান্তি ক'রতে লাগল। বলে কি! দিব্যি গিরিগিড়াসি, গোলাবারুদ, খরদার—ডাকাত কী রকম! কিন্তু পালাবোই বা কেমন করে? এখন বেশ রাত হয়েছে, সামনের চন্দ্রীমশুড়া বৃদ্ধ বসে লোকজনের সঙ্গে কথা কইচে—ওখান দিয়ে যেতে গেলেই তো সন্দেহ করবে। কাঠের মতো আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছি একেবারে—হাতে-পায়ে জোর নেই, কিন্তু ভাববারও শক্তি লোপ পেয়েছে। মিনিট পাঁচেক এমনি ভাবে কাটল—এমন সময়ে দেখি সেই বউটি আবার কি একটা কাজে কুঠুরীর মধ্যে ঢুকে দরজা দিয়ে আমার দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। মেয়েটি কথা বলবার পূর্বেই আমি বললুম, ‘তুমি যে হও, তুমি পরম দয়াময়ী—বলে দাও কোন পথে কী ভাবে পালাবো...’ বউটি চাপা গলায় বললে, ‘সেই জনোই এলুম। সব দেখে এলুম। পালাবার পথ নেই—ওরা খাঁটি দাগাতে রেখেচে...’ আমি বললুম, ‘তবে উপায়?’ মেয়েটি বললে, ‘একটা মাত্র উপায় আছে। তাও আমি ভেবে রেখেছি। আমি এ-বাড়িতে আর রওয়ান্না হতে দেব না—অনেক সহ্য করেছি, আর করব না... পীড়ন ঠাকুরামশাই, আর একবার বাড়ির মধ্যে থেকে আসি, নইলে সন্দেহ করবে।’ মিনিট পাঁচেক পরে বউটি আবার এল, দিকচক্ষুতে চারদিকে চেয়ে বললে, ‘শুনুন আমার উপায়—এই কথা কটা মনে রাখুন। মনে যদি রাখতে পারেন, তবে বাঁচাতে পারব... আমার নাম রাধা, আমি এ-বাড়ির মেজবউ, আমার বাপের বাড়ির গ্রামের নাম কুসুমপুর, জেলা বর্ধমান, থানা রায়না—আমার বাপের নাম হরিদাস মজুমদার, জ্যাঠামশাইয়ের নাম পাঁচকড়ি মজুমদার, আমরা দুই বোন, আমার দিদির নাম ফুলমতি, বিয়ে হয়েছে সামন্তপুর-তেহট্ট, বর্ধমান জেলা, শ্বশুরের নাম দুর্লভ দাস—সবাই জানে বারুই। আমার বাবা, জ্যাঠামশাই সব বেঁচে আছে, কিন্তু মা নেই।’ আমার তখন বুদ্ধি লোপ পেতে বসেচে—যা বলে মেয়েটি তাই করে যাই। এ হতে কি হবে? বউটি কিন্তু এক-একবার বাড়ির মধ্যে যায়, আবার অল্প দুমিনিটের জন্যে ফিরে এসে আমায় তালিম দিয়ে যায়—‘মনে আছে তো? জ্যাঠামশাইয়ের নাম কি?’ আমি বললুম, ‘হরিদাস মজুমদার, বাবার নাম হরিদাস মজুমদার... আমার দিদির নাম কি? শ্বশুরবাড়ি কোন গাঁয়ে?...’ ‘কাওরাদি হল—শ্বশুরবাড়িটা...’ ‘আপনি সব মাটি করলেন দেখি! সামন্তপুর-তেহট্ট, বর্ধমান... সামন্তপুর-তেহট্ট—শ্বশুরের নাম রামদু দাস—দুর্লভরাম দাস... অবশেষে মিনিট দশ-বারোর মধ্যে আমার কাছে সব পরিষ্কার হয়ে এসেছে। বউটি বললে, ‘রাধা-খাওয়া করে দিন ঠাকুরামশাই, কোনো ভয় করবেন না। আমার বাপের বাড়ির নাম-ধাম যখন হয়ে গেছে, তখন আপনাকে বাঁচাতে পেরেছি। এখন শুনুন—শাওয়াতাওয়ার পরেই শ্বশুরমশাইয়ের কাছে আমার বাপের বাড়ির পরিচয় দিন বলবেন—আপনি তাদের শুরবংশ, আমার নাম বলে জিজ্ঞেস করবেন—আমার বিয়ে হয়েছে কোথায়, জানো নাকি? গলা যেন না কাঁপে, কোনোরকম সন্দেহ যেন না হয়... আমি চাটলমশাই, আবার আপনি শশুরকে বলবার পরে; কিন্তু করবেন না বেশি, বিপদ কখন হয় বলা যায় না!’ রাধা-খাওয়া শেষ না করতেও তো সন্দেহ করতে পারে। রাধা-খাওয়া করতে হল। রাত্রির অন্ধকার তখন ঘন হয়ে এসেচে, রাত আন্দাজ দশটার কম নয়, আহালাদির পর নিজের কুঠুরিতে বসি, আর আমার মনে হয়েছে এ বাড়ির সবাই যেন খাঁড়ায়, রাম-দাতে শান দিচ্ছে আমার গলাটি কাটবার জন্য! এই সময় গৃহস্বামী সুরার আমার জানো পান দিয়ে বলল, ‘কি ঠাকুরামশাই, আহালাদি হল? এখন কি করে পড়ন। মশারিটা টাঙিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, রাত হয়েছে আর দেরি করবেন না...’ আমি বললুম, ‘হ্যাঁ, একটা কথা বলি। আমাদের এক মুখশাই, বাড়ি কুসুমপুর, থানা রায়না, নাম পাঁচকড়ি—ইয়ে, হরিদাস মজুমদার, তার একটি মেয়ের নাম মামা—এ দিকেই কোথায় গিয়ে হয়েছে! তারাও যাতে তোমাদের বাপ্পাই কিনা—তাই হয়তো চিনতে পারবে! মেয়েটার জ্যাঠা দূরন্তরাম—‘ইয়ে পাঁচকড়ি—আমায় বলে দিয়েছিল মেয়েটির শ্বশুরবাড়ির খোঁজ ক'রে একবার সেখানে যেতে... তা যখন এমনই এ দেশে!’ আমার কথা শুনে বৃদ্ধ যেন কেমন হয়ে গেল, আমার দিকে অবাক হয়ে চেয়ে বললে, ‘কুসুমপুরের হরিদাস মজুমদার? বাবা?... আপনি তাদের চিনলেন কি ক'রে?’ বাবার কথা স্মরণ ক'রে গলা না কাঁপিয়ে দৃঢ়স্বরে বললুম, ‘আমি যে তাদের গুরবন্ধনে—আমার বাবার ওরা সঙ্গিশাখা কিনা!’ বৃদ্ধ তাড়াতাড়ি বললে, ‘বসুন, আমি আসছি...’ আমি একটা কুঠুরীর মধ্যে বসে রইলুম, সন্দেহ ও ভয় তখনো কিছু যায়নি, আর এরা যে গুরদেবকেই রেগে দেবে তা কে বলতো! কিছুক্ষণ পরে বৃদ্ধ ফিরে এল, পেছনে পেছনে সেই বউটি, আর একজন বয়স্ক নারী গোছের যুবক এবং একজন প্রোট স্ত্রীলোক—সম্ভবত বৃদ্ধের স্ত্রী। বৃদ্ধ বললে, ‘এই যে বাবা, ঠাকুরামশাই! আমার ছেলেপেলের সঙ্গে... এই আমার মেজোছেলে শম্ভু—গডো করো, সব গডো... মেজবউমা, দেখ তো, চিনতে পারো ঐকে?’ চমৎকার অভিনেত্রী বউটি বামা! অদ্ভুত অভিনয় করে গেল বটো! ঘোমটা খুলে হাসিমুখে সে আমার পায়ের ধুলো নিয়ে প্রণাম ক'রলে গলায় আঁচল দিয়ে। জীবন্দাদা, দয়াময়ী বামা—আমার চোখে প্রায় জল এসে পড়ল। তারপর সে রাতটি তো কেটে গেল! খাবার জল দেওয়ার ছুতো করে এসে বামা আমায় শ্বাস

দিয়ে গেল। বলচে, ‘বিপদ কেটে গিয়েচে—আমার চোখে না পড়লে সর্বনাশ হত, ভিটেতে রুহবতো হত। অনেক হয়েছে—এই কুঠরিতে...এই বিছানায়, এই মেঝেতে অনেক লাশ পোতা...’ আমার মনে অবস্থা বলবার নয়। বললুম, ‘পুলিশ কি গাঁয়ের লোক কিছু টেন পায় না—কিছুই বল না?’ ‘কে কি বলবে? এ ফাঁসুড়ে ডাকাত গাঁ! সবাই এরকম। আসলে জানলে কি বাবা এখানে বিয়ে দিচ্ছেন? নিবার পর সব ধরা পড়ে গেলে আমার কাছে হন। আমার এতো হয়েছে—এ পাপ-ভিটিতে বাস ক’রলে তার অকূলান হবে। ওকে বারণ করি, কিন্তু ও কি করে? মাথার ওপর শ্বশুরমশাই রয়েছে—পুনো ডাকাত, দাদারা রয়েছে...আপনি ঘুমিয়ে পড়ুন বাবাঠাকুর, আর ভয় নেই...’ গ্রামের পূর্বপ্রান্তে বড়ো মাঠের ধারে বৃদ্ধের বাড়ি। বৃদ্ধের নাম নফচন্দ্র দাস। আমি চণ্ডীমণ্ডপে গিয়ে উঠতেই একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। কুকুরের এই ডাকটা আমার ভালো লাগল না; আর আমি কোন কারণ অর্থ আছে না, কিন্তু এই কুকুরের চিংকারে যেন একটা জঘন্যতা অশুভলক্ষণ অর্থ আছে—মঙ্গলসঙ্কর কার্যে গৃহস্থবাড়িতে আমি..., যেন শ্মশানভূমিতে এসেছি... বৃদ্ধের বাড়ি দেখে মনে হল বেশ অবস্থাপন্ন গৃহস্থ। বাড়ির উঠানে সারি সারি তিনটি বড়ো বড়ো ধানের গোলা—গোলায় সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলা ও গাঁয়ের প্রায় কুঠি-বাটহাটা। অন্তঃপুরের দিকে বারোখানা বড়ো বড়ো আটচালার ঘর। বাইরের এই চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে একখানা কুঠরি। আমার কথাটা ভালো করে বুঝতে গেলে এই কুঠরির কথা আর একটি ভালো করে শুনতে হবে। কুঠরিটিকে চণ্ডীমণ্ডপ-সংলগ্ন একটি কামরাও বলা যায়, কারণ একটি সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছন দিকের সঙ্গে সংলগ্ন, অথচ ঢাক বন্ধ করে দিলে বাইরের বাড়ির সঙ্গে এর সম্পর্ক চলে গিয়ে এটা ভেতরবাড়ির একখানা ঘরের সামিল হয়ে দাঁড়ায়। আমার বাসা দেওয়া হল এই কুঠরিতে। কুঠরির একপাশে ছোট একটি চালা। সেখান আমার রান্নার আয়োজন করে দিয়ে হাত মুখ ধুয়ে হয়ে আমি বিশ্রাম করছি। গৃহস্থামী এসে বললে, ‘ঠাকুরামশাই রাঁধা চাপান, আর রাত করেন কেন?’ আমি রান্নাচাপিয়ে বসে রাধা দিয়ে দিচ্ছি যাতে এমন সময় দেখি একটি বাড়ির বউ ভেতর থেকে একগালজুটি বাঁধা হাতে এসে আমার রান্নাচাপার সামনে দিয়ে ঢুকল ও বাঁট দিতে লাগল। কুঠরির দরজা খোলা, আমি যেখানে বসে সেখান থেকে কুঠরিটার ভেতর দেখা যায়। আমি দু-একবার বিস্ময়ের সঙ্গে দেখলুম, বউটি বাঁট দিতে আমার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখচে। দু-চারবার বেশ ভালো করে লক্ষ্য মনে হল, বউটি ইচ্ছে করেই আমার দিকে অমন করে চাইচে। ‘আমি শ্বশুরমশাইকে অবাক হয়ে গেলুম! ব্যাপার কী? সম্পূর্ণ অপরিচিতা মেয়ে, পল্লীর গৃহবধু—এমন ব্যবহার তো ভালো নয়! কি বিছানায় আমার পড়ে যাব রে বাবা! কতাকে কাছে বসিয়ে রাখতে দ্বিধা করব না কি? এমন সময় বউটি বাঁট শেষ করে চলে গেল। কিন্তু বোধ হয় দু’মিনিট পরেই আবার এলো। দেখে মনে হল সে যেন খুব বড়ো, উদ্বিগ্ন, উত্তেজিত। এবারও সে কিন্তু লোকজনের সম্পর্ক নেই। যে ভয় করেছিলুম, দেখলুম সবাই ভুলো। মানুষ মিথ্যে যে কেন এ-রকম ভয় দেখায়! প্রকাণ্ড দীঘীর পাড় ঘুরে যখন দেখলাম সারি ও দীঘির উঁচু পাড়কে পেছনে ফেলেছি, সামনেই দেখি ধানের আড়ালে মাঠের দূরে একটা গ্রাম ঝি-ঝি করেছে—নিশ্চয় ওটা সেই সজয়পুর!—বাঁচা গেল বাবা! কি ভাগটাই পেয়েছিলি লোকে! দিব্যি ফাঁকা মাঠ, কাছেই লোকের বসতি, গাঁয়ের গরুবাবুর চরছে মাঠে—কেন এসব জায়গায় বিপদ থাকবে? আমি এই রকম ভাবছি, এমনসময় তালপুকুরের এদিকের পাড়ের আড়ালে যে পথটা, সেই পথ বেয়ে একজন বৃদ্ধকে আমার দিকে আসতে দেখলাম। বৃদ্ধ বেশ বলিষ্ঠ গড়নের, এই বয়সেও মাংসপেশী বেশ সরল, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, হাতে ছোটো একটা লাঠি। বৃদ্ধ আমায় বললে, ‘ঠাকুরামশাই কোথায় যাবেন?’ ‘মাধমপুর!’ সে যে এখনো তিন ক্রোশ পথ... কাদের বাড়ি যাবেন?’ ‘শশী কবিরাজের বাড়ি।’ ‘ঠাকুরামশাই কি কবিরাজমশাইয়ের গোমস্তা?’ ‘গোমস্তা নই, তবে যাচ্ছি জমিজমার কাজে বটে!’ ‘এ অঞ্চলে আর কাউকে চেনেন?... মশাইয়ের নিজের বাড়ি কোথায়?’ ‘আমি এদিকে কখনো আসিনি, কাউকে চিনিও না। মাধমপুরেও নতুন যাচ্ছি...’ ‘সেখানে কেউ তাহলে আপনাকে চেনে না?’ ‘নাঃ, কি চিনবে!’ আমার এই কথা আমার এমন মনে হ’ল বৃদ্ধা বড়ো একটি ভাবলে, তারপর আমায় বললে, ‘কিছু যদি মনে না করেন একটা কথা বলি—রাতে আজ দয়া করে আমার বাড়িতে পায়ের ধুলো দিন। আমার জাতি বয়স্ক, জল-আচরণীয়, আপনার অসুবিধে হবে না। চণ্ডীমণ্ডপে পাশে বাইরের ঘর আছে, সেখানে থাকবেন, রান্নাবাড়ায় ক’রে থাকবেন... আপন দয়া করে...’ আমি বৃদ্ধের কথায় ভারি সন্তুষ্ট হলুম। সত্যিই তো, একালের লোকেরা অন্য ধরণের শিক্ষায় মানুষ। অতিথি-অভ্যাগতদের সেবা করাই এদের কুস্তি। বৃদ্ধ এই প্রস্তাব না করলে রাত-অন্ধকার ছেলে হয়তো পথে বইয়ে ও মুখ-আধাঁর-রাতে আমায় নিতেই তো হত মাধমপুরে, তিন ক্রোশ হেঁটে! সকাল হল। বিদায় নেওয়ার সময় বৃদ্ধ আমায় পাঁচ টাকা গুরু-প্রণামী দিলে। বামাকে আড়ালে ডেকে বললুম, ‘তুমি আমার মা, আমার জীবন্দাদাত্রী। আশীর্বাদ করি চিরসুখী হও মা...’ বামার মতো বুদ্ধিমত্তী নারী জীবনে আর আমার চোখে পড়েন না। কতকাল হয়ে গেল, এই বৃদ্ধ বয়সেও সেই দয়াময়ী পল্লীবধূটির স্মৃতিতে আমার চোখে জল এসে পড়ে, শ্রদ্ধায় মন পূর্ণ হয়ে ওঠে।